মাকাসিদুশ শরিয়াহ

শরিয়ার উদ্দেশ্য ও কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্যের সমন্বয়

ড. ইউসুফ আল কারজাভি (রহ.)

ভাষান্তর : তারিক মাহমুদ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

◈ পরিভাষা ১১
◈ ভূমিকা ১৩
◈ নতুন কিছু ফিকহ ১৬

ফিকহু মাকাসিদুশ শরিয়াহ ১৯
◈ শরিয়ার পরিচয় ১৯
◈ মাকাসিদুশ শরিয়ার অর্থ ২৪
◈ মহিলাদের উত্তরাধিকারী হওয়ার হিকমত ২৬
◈ মাকাসিদ বের করার উপায় ২৭
◈ পাঁচটি মৌলিক বিষয়ে মাকাসিদকে সীমাবদ্ধ করা ৩১

শরিয়ার উদ্দেশ্য এবং নসের সমন্বয় ৩৪

মৌলিক মাকাসিদ এবং প্রাসঙ্গিক নুসুস ৩৭
◈ মাকাসিদসংক্রান্ত তিনটি চিন্তাধারা ৩৭

প্রথম চিন্তাধারা : নব্য জাহেরি চিন্তাধারা ৪১
◈ নব্য জাহেরি চিন্তাধারা : মাকাসিদ এড়িয়ে নুসুস অধ্যয়ন ৪১
◈ নব্য জাহেরি চিন্তাধারার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ৪৬
◈ নব্য জাহেরি চিন্তাধারার ভিত্তি ৫২
◈ এই চিন্তাধারার পরিণাম ও ফলাফল ৫৬
◈ ইল্লত ও জনকল্যাণের রক্ষণাবেক্ষণের ওপর শরিয়ার ভিত্তি ৬৬
◈ শরয়ি বিধানের ক্ষেত্রে সাহাবিদের মাকাসিদ অনুসরণ ৬৮
◈ মুয়াজ (রা.) কর্তৃক শস্যের জাকাত মূল্যের মাধ্যমে নির্ধারণ ৬৮
◈ উমর (রা.) কর্তৃক রক্তপণের দায়িত্ব গোত্র থেকে দিওয়ানে স্থানান্তর ৭০

দ্বিতীয় চিন্তাধারা : নব্য মুয়াত্তিলা ৭২
◈ মাকাসিদ ও মাসালিহের নামে নুসুসকে রহিতকরণ ৭২
◈ নব্য মুয়াত্তিলা চিন্তাধারার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ৭৭
◈ নব্য মুয়াত্তিলা চিন্তাধারার ভিত্তি ৮১
- ওহির ওপর আকলকে প্রাধান্য দেওয়া ৮১
- উমর (রা.) কর্তৃক মাসালিহের নামে নুসুস এড়িয়ে যাওয়ার দাবি ৮৬
- মুয়াল্লাফাতুল কুলুবের অংশ বাতিল করার দাবি ৮৭

▪ উমর (রা.) কর্তৃক দুর্ভিক্ষের বছর চুরির হদ স্থগিত করা ৯১
◈ এই চিন্তাধারার ফলাফল ও অবস্থান ১০০
▪ অকাট্য নুসুস এড়িয়ে সন্দেহজনক বিষয় নিয়ে লেগে থাকা ১০১
▪ মাসলিহের নামে ইসলামের আরকান ও হুদুদের বিরোধিতা ১০৬
▪ একজন আইনবিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের সংশয় ১০৭
▪ অধ্যাপকের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব ১০৯
▪ তুফির কাছে অধ্যাপকের আবেদন ১১৪
তৃতীয় চিন্তাধারা : আল ওয়াসাতিয়্যাহ বা মধ্যমপন্থি চিন্তাধারা ১২০
◈ প্রাসঙ্গিক বিষয়ের নস ও সামগ্রিক মাকাসিদের সমন্বয় ১২০
◈ মধ্যমপন্থি চিন্তাধারার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ১২৮
◈ মধ্যমপন্থি চিন্তাধারার ভিত্তি ১৩৪
▪ মাকসিদ নিয়ে গবেষণা ১৩৪
▪ নসকে প্রেক্ষাপটের আলোকে উপলব্ধি ১৪০
▪ স্থির মাকাসিদ ও পরিবর্তনশীল উপকরণের মধ্যে পার্থক্যকরণ ১৫৩
▪ অপরিবর্তনীয় ও পরিবর্তনশীল বিষয়গুলো উপযুক্ততা অনুসারে গ্রহণ ১৭৯
▪ ইবাদত ও মুয়ামালাতের ক্ষেত্রে অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত ১৮২

মাকাসিদুশ শরিয়াহ

দ্বিতীয় যে কথাটি বলতে চাই তা হলো—'মাকাসিদুশ শরিয়াহ', যাকে কেন্দ্র করেই আমরা আজ পূর্ব ও পশ্চিমের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একত্রিত হয়েছি। এ সম্মেলন আমাদের যা নিয়ে কাজ করতে আহ্বান জানাচ্ছে। আমরা এখানে শরিয়াহ, মাকাসিদ ও ফিকহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

শরিয়ার পরিচয়

আল কামুস এবং তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ অনুযায়ী শরিয়াহ হলো—আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য দ্বীন হিসেবে যা বর্ণনা করেছেন অথবা যা কিছু দ্বীন হিসেবে প্রণয়ন করেছেন এবং তাঁর ইবাদত ও মুয়ামালাত হিসেবে যার আদেশ দিয়েছেন। যেমন : ইবাদতের মধ্যে সাওম, সালাত, হজ, জাকাত এবং সকল সৎকর্ম; মুয়ামালাতের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়, বিয়েশাদি ইত্যাদি।[১] আল্লাহ বলেন—

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ-

'অতঃপর (হে নবি!) আমি তোমাকে দ্বীনের সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি।'[২]

তার উৎপত্তি شرع الشيء থেকে মানে বর্ণনা করা, সুস্পষ্ট করা। অথবা তার উৎপত্তি الشرعة والشريعة থেকে। মানে যা থেকে অনবরত পানি প্রবাহিত হয়, যা শেষ হওয়ার নয় এবং তা পাওয়ার জন্য কোনো যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না।[৩]

রাগিব ইস্পাহানি তাঁর *মুফরাদাতিল কুরআন*-এ বলেন, শারউ মানে সুস্পষ্ট পথে পরিচালিত হওয়া। বলা হয়, আমি তাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করেছি। আর শরউ হলো ক্রিয়ামূল। পরে তা সুস্পষ্ট পথ হিসেবে বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

শিরউ, শারউ, শরিয়াহ ইলাহের দেখানো সঠিক পথের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

রাগিব ইস্পাহানি তাঁর কিতাবে প্রবীণদের মত উল্লেখ করেন, শরিয়াহকে শরিয়াহ বলা হয় পানির ঝরনার সাথে তার সামঞ্জস্যের কারণে। কারণ, যে শরিয়াহ গ্রহণ করে, প্রকৃতপক্ষে সে পরিতৃপ্ত ও পবিত্র হয়। তিনি বলেন, পরিতৃপ্তি বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি, জ্ঞানী ব্যক্তিরা যা বলেন—আমি পান করেছি, কিন্তু পরিতৃপ্ত হইনি। কিন্তু যখন আল্লাহ তায়ালাকে চিনলাম, কোনো কিছু পান করা ছাড়াই আমি পরিতৃপ্ত হয়ে গেছি। আর পবিত্রতা (তাতহহুর)[৪] বলতে বোঝাতে চেয়েছি, আল্লাহ তায়ালা যা বলেছেন—

اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا-

---

[১] *আল কামুস; তাজুল উরুস*

[২] সূরা জাসিয়া : ১৮

[৩] *মুজামু আল ফাজিল কুরআনিল কারিম* : ২/১৩

[৪] ইমাম রাগিব ইস্পাহানি, *মুফরাদাতুল কুরআন*, পৃষ্ঠা : ৪৫০-৪৫১

‘হে নবিপরিবার! আল্লাহ চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূরীভূত করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।’[৫]

শিন-রা-আইন (شرع) মূলধাতু থেকে উৎপন্ন শব্দ বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ হিসেবে কুরআনুল কারিমে পাঁচবার ব্যবহৃত হয়েছে। অতীত কালবাচক ক্রিয়া হিসেবে আল্লাহ তায়ালার বাণী—

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ-

‘তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নুহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে ওহি পাঠিয়েছি এবং ইবরাহিম, মুসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হলো— তোমরা দ্বীন কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না।’[৬]

আর এখানে আল্লাহ তায়ালা যা প্রবর্তন করেছেন, তা শরিয়ার মূলনীতি বা উসুল, শাখা-প্রশাখার বিষয় বা ফুরুউ নয়। এটা বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত, কর্মের সাথে নয়। আর এ কারণেই তার ওপর নুহ (আ.)-এর সময় থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ (সা.)-এর সময় পর্যন্ত সকল ইলাহি রিসালাত একমত। একই সূরায় আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের নিন্দা করতে গিয়ে ‘শিন-রা-আইন’ মাদ্দাহ ব্যবহার করেছেন—তারা দ্বীনি বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করার ক্ষমতা হাতে তুলে নিয়েছে। আল্লাহ তো তাদের এ অনুমতি দেননি। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ-

‘তাদের কি এমন কোনো শরিক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?’[৭]

অতঃপর তারা আল্লাহ তায়ালার আদেশ ছাড়া হালাল গণ্য করেছে, হারাম গণ্য করেছে, ওয়াজিব করেছে, হুকুম রহিত করেছে।

এগুলো ছিল মাক্কি কুরআনে। আর মাদানি কুরআনে আল্লাহ তায়ালার বাণী হিসেবে সূরা মায়েদায় এসেছে—

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا-

‘তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরিয়াহ ও স্পষ্ট পন্থা।’[৮]

শরিয়াহ অভিধানে তরিকা বা পথ অর্থে এসেছে, কুরআনুল কারিমেও ঠিক একই অর্থে এসেছে। সেটা হলো আল্লাহ তায়ালার বাণী—

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ-

---

[৫] সূরা আহজাব : ৩৩

[৬] সূরা শুরা : ১৩

[৭] সূরা শুরা : ১১

[৮] সূরা মায়েদা: ৪৮

‘তারপর আমি তোমাকে দ্বীনের এক বিশেষ বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ করো। আর যারা জানে না, তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না।’[৯]

লক্ষ করুন, শরিয়াহ শব্দটি কুরআনুল কারিমে শুধু এই স্থানেই ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা জাসিয়ায়। আর এটা মাক্কি সূরা। অর্থাৎ আহকামসংক্রান্ত আয়াত, বিধিবিধান ও এ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি নাজিলের আগে। আর তা নাজিল হয়েছে মদিনায়। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচারকরা এখানে একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করে। তারা বলে, শরিয়াহ শব্দটি কুরআনুল কারিমে আইন প্রণয়ন বা কানুনের অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। সুতরাং তোমরা কেন ইসলামি আইন নিয়ে এত বেশি জোর দিচ্ছ? যেখানে কুরআন শব্দটি এ অর্থে ব্যবহারই করেনি।

বিষয়টি যদি শব্দের ব্যবহারের সাথে জড়িত হয়, তাহলে বলা যায়—কুরআনে আকিদা শব্দটির ব্যবহারই নেই; মাক্কি সূরাতেও না, মাদানি সূরাতেও না। তাহলে তোমরা কেন আকিদা বিষয়ে এত জোর দিচ্ছ?

একইভাবে বলা যায়, কুরআনে ফজিলত শব্দটির উল্লেখ নেই, তাহলে ফজিলত নিয়ে এত জোর দেওয়া হচ্ছে কেন?

এই বিভ্রান্তি খুব সহজ ও সুস্পষ্ট। বিবেকবান কেউ এটাকে জটিল মনে করে না। কারণ, কোন শব্দ ব্যবহার করা হলো সেটা মুখ্য কিছু নয়; বরং সে শব্দ ব্যবহার করে কী বোঝানো হয়েছে, সেটাই ধর্তব্য। কুরআন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক আহকাম/আইন ধারণ করে। যেমন—

- ইবাদতসংক্রান্ত আহকাম
- পারিবারিক বিষয়াদিসংক্রান্ত আহকাম
- প্রশাসনিক ও ব্যবসায়সংক্রান্ত আইন
- সম্পদ, কর/খাজনা, রাষ্ট্রীয় আয় ও ব্যয়সংক্রান্ত আইন
- অপরাধ ও শাস্তিসংক্রান্ত আইন, যেমন : হুদুদ, কিসাস, তাজির ইত্যাদি
- রাজনৈতিক বিষয়াবলি, শাসনের নীতি, শাসক ও জনগণের সম্পর্ক এবং শান্তি ও যুদ্ধাবস্থায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আইন
- জিহাদসংক্রান্ত বিধান

আর যে সকল আয়াত এ বিষয়গুলো ধারণ করে, তা পাঠকদের কাছে আয়াতুল আহকাম বা বিধানসংক্রান্ত আয়াত নামে পরিচিত।

শুধু এ আয়াতগুলো নিয়ে প্রাচীন ও আধুনিক স্কলাররা অনেক লেখালেখি করেছেন। যেমন : ইমাম আবু বকর আর-রাজির আল হানাফির[১০] *আহকামুল কুরআন*। ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবি আল মালেকির[১১] *আহকামুল কুরআন*। ইমাম শাফেয়িরও *আহকামুল কুরআন* নামে গ্রন্থ আছে, হাফেজ আবু বকর আল বায়হাকি আশ শাফেয়ি[১২] তা একত্রিত করেছেন। ইমাম সুয়ুতির[১৩] *আল*

---

[৯] সূরা জাসিয়া : ১৮

[১০] যিনি জাস্‌সাস নামে পরিচিত, মৃত্যু : ৩৭৯ হিজরি

[১১] মৃত্যু : ৫৪৩ হিজরি

[১২] মৃত্যু : ৪৫৮ হিজরি

ইকলিল ওয়া ইসতিম্বাতুত তানজিল। আর আধুনিক সময়ে শাইখ মুহাম্মাদ আলি আস-সায়েসর *আয়াতু তাফসিরিল আহকাম*।

আমাদের সময়ে 'শরিয়াহ' শব্দের ব্যবহার : আমরা আমাদের সময়ে উলামাদের শরিয়াহ শব্দটি নিম্নোক্ত দুটি বিষয়ের কোনো একটি বিষয়ে ব্যবহার করতে দেখি।

এক. আকিদা, নিদর্শন, আদব, আখলাক, আইনকানুন ও মুয়ামালাতসহ পুরো ইসলাম। অর্থাৎ, শরিয়াহ শব্দটিকে মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখার বিষয়, আকিদা ও আমল, তাত্ত্বিক ও বাস্তবিক সবকিছুর জন্য ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এটা তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের মতো ঈমান ও আকিদার বিষয়গুলোকে যেমন শামিল করে, তেমনই ইবাদত, মুয়ামালাত ও আচরণের মতো অন্যান্য যা কিছু ইসলাম নিয়ে এসেছে, কুরআন সুন্নাহ যা কিছু ধারণ করেছে এবং উলামাগণ আকিদা, শরিয়াহ ও আখলাক নামে যা কিছু ব্যাখ্যা করেছে, তার সবকিছুই শামিল করে।

দুই. দ্বীনের আমলগত বিধানাবলি তথা ইবাদত, মুয়ামালাত ইত্যাদি, যেমন : আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও তাঁর ইবাদত, পারিবারিক ও সামাজিক আইন, উম্মাহর বড়ো ও ছোটো ইস্যু, রাষ্ট্র ও শাসন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি। আর এটা হলো ইলমুল ফিকহের ক্ষেত্র, যাতে ইসলামি ফিকহের বিভিন্ন মাজহাব কাজ করে। আর এগুলো ইলমুল কালাম বা ইলমুত তাওহিদ তথা আকিদাশাস্ত্রের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। বলা হয়ে থাকে, ইসলাম হলো আকিদা ও শরিয়ার সমন্বয়।

আল আজহারসহ অন্য ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইসলামি শিক্ষার জন্য দুটি পৃথক ফ্যাকাল্টি প্রতিষ্ঠা করেছে। একটি হলো—উসুলুদ দ্বীন ফ্যাকাল্টি; যা আকিদাসংক্রান্ত বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট। অন্যটি শরিয়াহ ফ্যাকাল্টি। আর এটি ইসলামের শাখা-প্রশাখা তথা আমলগত বাস্তব কর্মের বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট।

আর এ কারণেই শরিয়ার পরিচিতি নির্ধারিত করা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আমরা যখন মাকাসিদুশ শরিয়াহ বলব, তখন কি আমাদের উদ্দেশ্য হবে শরিয়াহ আমলগত দিক বা শুধু ফিকহের মাকাসিদ, নাকি আকিদা ও ফিকহের সমষ্টি পুরো ইসলামের মাকাসিদ?

আর আমি যাকে প্রাধান্য দেবো তা হলো, আমরা এখানে পুরো ইসলামের মাকাসিদ উদ্দেশ্য করছি। আর উসুলবিদগণ, যারা মাকাসিদুশ শরিয়াহকে পাঁচটি মৌলিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ করেছেন, তারা আকিদাকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর এ কারণেই দ্বীনের সংরক্ষণকে তারা প্রথম জরুরি বিষয় করেছেন। আর আকিদা হচ্ছে দ্বীনের মূল স্তম্ভ ও ভিত্তির পুরোটুকু।

মাকাসিদুশ শরিয়ার অর্থ

আর মাকাসিদুশ শরিয়ার অর্থ হচ্ছে—সেই সকল চূড়ান্ত উদ্দেশ্য, কুরআন-সুন্নাহর উক্তিসমূহের আদেশ, নিষেধ ও মুবাহ দ্বারা যা হাসিল করতে চাওয়া হয়। আর বিভিন্ন বিষয়ের আহকাম

---

[১৩] মৃত্যু : ৯১১ হিজরি

মুকাল্লিফদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সংঘবদ্ধ জীবন এবং উম্মাহর মাঝে যা বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করে।

আর মাকাসিদকে বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক আহকামসমূহের পেছনে যে হিকমত আছে, তার অর্থেও ব্যবহার করা যায়। বান্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে জারি করা প্রত্যেক হুকুমের পেছনে হিকমত রয়েছে। যে জানার, সে তা জানতে পারে। আর যে জানার নয়, সে তা জানতে পারে না। কারণ, আল্লাহ তায়ালা অকারণে ও অনর্থক কোনো আইন প্রবর্তন থেকে পবিত্র। তিনি পবিত্র হিকমতের বিপরীত আইন প্রবর্তন থেকেও।

মাকাসিদ দ্বারা সে ইল্লত উদ্দেশ্য নয়, কিয়াসের গবেষণায় উসুলবিদগণ যা বর্ণনা করেছেন। ইল্লতের সংজ্ঞায় তারা বলেন—হুকুমের সাথে সংশ্লিষ্ট নিয়মতান্ত্রিক একটি বাহ্যিক গুণের নাম ইল্লত। আর তা হচ্ছে হুকুমের কারণ। মাকসাদ নয়। যেমন : তারা সফরে নামাজকে কসর করা, রমজানে রোজা ভঙ্গ করা ইত্যাদি রুখসতের ব্যাপারে বলেন—এখানে ইল্লত হচ্ছে সফর। কারণ, সফর অবস্থায় ব্যক্তি এমন কষ্টের সম্মুখীন হয়, স্বাভাবিক অবস্থায় যার সম্মুখীন সে হয় না। অতএব, এই কষ্টের সম্মুখীন হওয়া হচ্ছে রুখসতের হিকমত। ইল্লত নয়। ইল্লত হচ্ছে সফর করা।

তারা হুকুমকে হিকমতের সাথে সম্পৃক্ত করেনি। কারণ, তা নির্ণয় করা খুব কঠিন। ফলে তার ওপর নির্ভর করে হুকুম এলে তা জটিলতা, হতবুদ্ধিতা ও অসুবিধার কারণ হবে। যদি বলা হয়, মুসাফিরের জন্য সালাত কসর করা, দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্র করা এবং রোজা ভাঙার অনুমতি রয়েছে; যদি সে কষ্ট অনুভব করে। তাহলে এক্ষেত্রে মানুষের মাঝে বিভিন্ন ধরনের বিভক্তি দেখা যাবে। কারও ক্ষেত্রে দেখা যাবে—প্রচণ্ড কষ্ট হওয়ার পরও সে খোদাভীরুতার কারণে বলবে, আমার মোটেই কষ্ট হচ্ছে না। আবার কারও সামান্য কষ্ট না হলেও সে বলবে, আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে।

মজার বিষয় হচ্ছে, আমাদের ফকিহগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিকমত বিবেচনা না করে ইল্লত বিবেচনা করেছেন। যেমন : মুসাফিরের সাওমের ক্ষেত্রে ইল্লত অর্থাৎ সফরকে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু অসুস্থ রোগীর সিয়ামের ক্ষেত্রে তারা হিকমত বিবেচনা করেছেন, ইল্লত নয়। তাই তারা বলেন না, যেকোনো রোগ হলেই রোগী সাওম ছাড়তে পারবে, ঠিক যেমন মুসাফির যেকোনো সফরে সাওম ছাড়তে পারে। তারা বরং শুধু সেই অসুস্থতাকে বিবেচনা করেছেন, যা সিয়ামের ফলে বেড়ে যায় বা সিয়ামের কারণে তা থেকে আরোগ্য পেতে দেরি হয়।

আমি মনে করি, যদি হিকমত সুস্পষ্ট হয়, তবে হুকুমের জন্য হিকমতের ওপর নির্ভর করা উচিত। আরও মনে করি, মাকাসিদকে মনে করা যায় : হিকমাতুশ শরিয়াহ বা হুকুমের পেছনে থাকা চূড়ান্ত কারণ।

হিকমত কখনো হয় স্পষ্ট ও প্রকাশ্য, সাধারণ আকল সামান্য চিন্তা করলেই তা উপলব্ধি করতে পারে। যেমন : মৃত নিকটাত্মীয়ের রেখে যাওয়া সম্পদে বালেগ পুরুষদের সাথে নারী ও শিশুদের উত্তরাধিকারী হওয়া। এ বিধানটি আরবদের ওয়ারিশি সম্পদ বণ্টনের নীতির খেলাফ ছিল। তারা শুধু অস্ত্র ধরতে এবং কাবিলা বা গোত্রের প্রতিরক্ষা করতে সক্ষমদের উত্তরাধিকার সম্পদে ভাগ

দিত। নারীদের উত্তরাধিকার সম্পদে কোনো ভাগ ছিল না। কারণ, যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষায় তাদের কোনো অংশগ্রহণ ছিল না। একইভাবে বাচ্চা ছেলেসন্তানও উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। কারণ তারা কাবিলা, অন্য কোনো পক্ষ বা নিজেদের সুরক্ষা দিতে কাজ করত না।

অতঃপর কুরআন এলো এবং বাবা, মা, স্ত্রী, পরিজন, ঔরসজাত ও নিকটাত্মীয়দের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলো। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ ۖ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا-

'মাতা-পিতা এবং আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে; আর মাতা-পিতা এবং আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; তা অল্পই হোক আর বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।'[১৪]

আর এটাই সুবিচার। কারণ, কন্যাসন্তান ঠিক সেভাবেই পিতা-মাতার সাথে সম্পর্কযুক্ত, যেমন তার সহোদর ভাই পিতা-মাতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাহলে কেন তার ভাই উত্তরাধিকারী হবে, আর সে বঞ্চিত হবে? মেয়ে মৃত্যুবরণ করলে পিতা তার উত্তরাধিকারী হয়, তাহলে পিতা মৃত্যুবরণ করলে সে হবে না কেন? স্বামী স্ত্রীর উত্তরাধিকারী হয়, তাহলে স্ত্রী কেন হবে না?

মহিলাদের উত্তরাধিকারী হওয়ার হিকমত

কিন্তু কন্যাসন্তানের উত্তরাধিকার তার সহোদর ভাইয়ের অর্ধেক হওয়ার হিকমত বা শরয়ি মাকসাদ কখনো কখনো (চিন্তাশীল লোক ব্যতীত) আরও জন্য অস্পষ্ট হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْۤ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ-

'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ।'[১৫]

কিছু কিছু মানুষ এ বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। তারা প্রশ্ন উত্তোলন করে—কেন পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে? অথচ তারা দুজনই পরিপূর্ণ সত্তার অধিকারী মানুষ। তাদের দুজনই একই মূলের দুটি শাখা। দুজনই সরাসরি সন্তান এবং তাদের নৈকট্য/দূরত্বও একই। কিন্তু যিনি আহকামগুলোর একটিকে অন্যগুলোর সাথে মিলিয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, তার কাছে এটি স্পষ্ট—বাবা-মায়ের সম্পত্তিতে পুত্র ও কন্যাসন্তানের অংশ ভিন্ন হওয়ার কারণ তাদের দুজনের ওপর দায়িত্ব, কর্তব্য ও আর্থিক বোঝার বিভিন্নতা।

যদি আমরা ধরি, একজন বাবা মারা গেলেন আর তিনি এক পুত্র, এক কন্যা ও ১৫ লাখ টাকা রেখে গেলেন। তাহলে পুত্র ১০ এবং কন্যা ৫ লাখ উত্তরাধিকার পাবে। কিন্তু পুত্র যদি বিবাহ করতে ইচ্ছে করে, আমরা তার নববধূর জন্য আড়াই লাখ টাকা মোহর নির্ধারণ করি। তাহলে

---

[১৪] সূরা নিসা : ৭

[১৫] সূরা নিসা : ১১

তার উত্তরাধিকার সম্পদ কমে সাড়ে সাত লাখে এসে দাঁড়াবে। আর কন্যার যদি বিবাহ হয় এবং আমরা তার ভাইয়ের তার জন্য আড়াই লাখ মোহর ধার্য করি, তাহলে তার সম্পদ বেড়ে সাড়ে সাত লাখে গিয়ে পৌঁছাবে। এভাবেই তাদের সম্পদ সমান সমান হয়ে যাবে।

তা ছাড়া আমরা যদি পুত্রের ওপর বাড়ি নির্মাণ, ওলিমা, নববধূর জন্য উপহার ইত্যাদি বিভিন্ন খরচ চাপিয়ে দিই, তাহলে তার সম্পদের ঘাটতি আরও বেড়ে যাবে। বিপরীতে তার বোনের সম্পদ উপহার ইত্যাদি পেয়ে আরও বেড়ে যাবে। এ কারণে অনেক গবেষক মনে করেন, ইসলামি শরিয়াহ মিরাসের ক্ষেত্রে কন্যাসন্তানকে বরং একটু বেশিই দিয়েছে।[১৬]

মাকাসিদ বের করার উপায়

হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামিদ আল গাজালির আবিষ্কৃত পদ্ধতি ছাড়া কি মাকাসিদুশ শরিয়াহ বের করার অন্য কোনো উপায় রয়েছে? তিনি তাঁর কিতাব *আল মুসতাশফায়* কল্পিত মূলনীতি ধরে শরিয়ার মাকসাদের সন্ধানে আলোচনা করে এই বস্তুনিষ্ঠ উপসংহারে পৌঁছেছেন। উপসংহারে তিনি মাকসিদ তত্ত্বের মূলভিত্তি আবিষ্কার করেন। যুগের পর যুগ ধরে ইসলামি চিন্তাধারা যাকে আঁকড়ে ধরে আছে। তিনি মাকাসিদকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেন—জরুরিয়াত, হাজিয়াত, তাহসিনাত (জরুরি, প্রয়োজনীয় ও শোভাবর্ধক)। তার আবিষ্কৃত পদ্ধতি ভিন্ন কোনো তরিকায় কি মাকাসিদ বের করার সুযোগ আছে?

আমি ভিন্ন কোনো পদ্ধতিতে মাকাসিদ বের করতে কোনো বাধা দেখি না। আমি মনে করি, আমরা আরও কিছু পদ্ধতিতে মাকাসিদুশ শরিয়াহ বের করতে পারি।

ক. কুরআন, সুন্নাহর যে সকল নুসুসের মাঝে ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন, যাতে আমরা তা থেকে ইসলামে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানতে পারি। যেমন : সূরা হাদিদে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ-

‘নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদের স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাঁদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদণ্ড নাজিল করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।’[১৭]

এ আয়াত আমাদের ন্যায়নিষ্ঠতার মূল্যবোধ বর্ণনা করছে। এই ন্যায়নিষ্ঠতাই হচ্ছে সমস্ত আসমানি শরিয়ার মূল মাকসাদ। এ আয়াতে মাকসাদ বর্ণনা করা হয়েছে ‘লামুত তালিল’ বা ব্যাখ্যাকারী লামের মাধ্যমে।

আল্লাহ তায়ালার বাণী—

مَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ -

---

[১৬] সালাহ উদ্দিন সুলতান, *ইমতিয়াজুল মারআতি আলার রজুলি ফিল মিরাসি ওয়ান নাফকাতি*

[১৭] সূরা হাদিদ : ২৫

‘আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে ফাই হিসেবে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর, রাসূলের, আত্মীয়স্বজনদের, এতিমদের, মিসকিন ও মুসাফিরদের এটি এজন্য যে, যাতে ধনসম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের মাঝেই কেবল আবর্তিত না থাকে।’[১৮]

সুতরাং এই দরিদ্র গোষ্ঠী, বিশেষ করে অভাবী ও প্রয়োজনগ্রস্তদের মধ্যে ফাইয়ের সম্পদ বণ্টন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—সম্পদ থেকে লাভবান হওয়ার নীতি সম্প্রসারণ। যাতে ধনীরা একচেটিয়াভাবে তা অধিকার করে নিতে না পারে এবং সম্পদ কেবল তাদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়; যেমনটা পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য। পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো—সম্পদ কেবল ধনীদের হাতেই আবর্তিত হতে থাকবে।

এ আয়াতে মাকাসিদকে হরফে তালিল كي (কাই)-এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে।

তালিলের হরফ ছাড়াও ভিন্নভাবে তালিল করা যায়। যেমন : রাসূল (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলা আল্লাহ তায়ালার বাণী—

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ-

‘আর আপনাকে আমরা পাঠিয়েছি বিশ্ববাসীর প্রতি রহমত হিসেবে।’[১৯]

এখানে তালিল রয়েছে আল্লাহর বাণী ‘আপনাকে পাঠানো হয়েছে সকল সৃষ্টিকুলের মাঝে রহমত ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য’-এর মাঝে।

আল্লাহ তায়ালার বাণী—

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ. يّٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

‘হে জ্ঞানবান লোকেরা! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো।’[২০]

এখানে তালিল রয়েছে আল্লাহ তায়ালার বাণী ‘আমরা কিসাসের বিধান করেছি জীবনের নিরাপত্তার জন্য’ কথার মধ্যে। আমরা দেখতে পাই— কুরআন নিজেই সালাত, সিয়াম, জাকাত হজ ইত্যাদি ইবাদতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছে।

খ. বিভিন্ন বিষয়ের হুকুমসমূহের সামগ্রিক অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ, গভীর মনোনিবেশ এবং সেগুলোর একেকটিকে অন্যটির সাথে মেলানো, যাতে আমরা এ সামগ্রিক অধ্যয়ন থেকে সবগুলো বিষয়ে প্রযোজ্য এমন একটি মাকসাদ বা কয়েকটি মাকসাদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি, শরিয়াহপ্রণেতা যা আহকামগুলো প্রণয়নের দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন।

ইমাম গাজালি এ পদ্ধতির পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। আর ইমাম শাতেবি তা অনুসরণ এবং বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

---

[১৮] সূরা হাশর : ৭

[১৯] সূরা আম্বিয়া : ১০৭

[২০] সূরা বাকারা : ১৭৯

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—ইমাম গাজালি এবং তাঁর পরে কাররাফি, শাতেবিসহ অন্যরা যে পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন, তা ছাড়া অন্য কোনোভাবে মাকাসিদকে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব কি?

আমি মনে করি, হ্যাঁ এটা সম্ভব এবং বাস্তবে অনেকে এটা করেছেন। আমরা বর্তমান সময়ের স্কলারদের দেখি, তারা যখন ইসলামের মাকাসিদ, রিসালাতুল মুহাম্মাদিয়া বা মাকাসিদুল কুরআন নিয়ে কথা বলেন, তারা একে পাঁচটি সামগ্রিক মাকসাদ ও তার শাখা-প্রশাখার মাঝে সীমাবদ্ধ করেন না।

আল্লামা সাইয়্যেদ রশিদ রিদা তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ *আল ওহি আল মুহাম্মাদি*তে মাকাসিদুল কুরআন নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি উসুলবিদদের মতো কল্যাণ বাস্তবায়নের তিনটি স্তর জরুরিয়াত, হাজিয়াত ও তাহসিনিয়াতের পদ্ধতি অবলম্বন না করে ভিন্ন পদ্ধতিতে কুরআনের মাকসাদ উল্লেখ করেছেন। বরং তিনি তাকে ইসলাম যে যে বিষয়ে কাজ করে, সেই সেই বিষয়ের আলোকে এবং উম্মাহর জীবনে কুরআন যে সকল বড়ো মৌল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে চায়, তার আলোকে ভাগ করেছেন। তিনি মানবতার পরিশুদ্ধির জন্য ১০টি মাকসাদ নির্ণয় করেছেন।

১. দ্বীনের তিনটি আরকানের পরিশুদ্ধি।

২. আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এবং সৎকর্মশীল মানুষকে নবুয়ত, রিসালাত ও রাসূলদের দায়দায়িত্ব অবহিত করা।

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا-

'যে আল্লাহ ও বিচার দিবসের ওপর ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে।'

৩. এটা বর্ণনা করা—ইসলাম স্বভাবজাত, আকল, ইলম, হিকমত, বোরহান, স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতার দ্বীন।

৪. আটটি বিষয় বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধন।

৫. ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা তথা ইবাদত ও হারামের ক্ষেত্রে ইসলামের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিষ্ঠিত করা।

৬. ইসলামের আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক মূলনীতির বয়ান।

৭. অর্থনীতি ও সম্পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংস্কারের পথপ্রদর্শন।

৮. যুদ্ধনীতির সংস্কার ও তার অকল্যাণ থেকে সুরক্ষা এবং তাকে মানবতার কল্যাণে সীমাবদ্ধ করা।

৯. নারীদের সকল মানবিক, ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার প্রদান করা।

১০. দাসকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা।

এ বিষয়টি আমি আমার *কাইফা নাতায়ামালু মায়াল কুরআন* বইতে আলোচনা করেছি। সেখানে আমি সাতটি মাকাসিদ উল্লেখ করেছি। তা হলো—

ক. ইলাহিয়াহ, রিসালাহ ও পরকালীন প্রতিদানের বিষয়ে আকিদা বিশুদ্ধ করা।

খ. মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সুনির্দিষ্ট করা; বিশেষ করে দুর্বলদের।

গ. আল্লাহর ইবাদত ও তাকওয়ার দিকে আহ্বান।

ঘ. মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধি ও চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জন।

ঙ. সুস্থ পরিবার গঠন ও নারীর প্রতি সুবিচার।

চ. মানবতার জন্য সাক্ষী হওয়ার উপযোগী উম্মাহ গঠন।

ছ. পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত মানবিক পৃথিবী গড়ার আহ্বান।

এ বিষয়টি আমি আরও বিস্তারিত বর্ণনা করেছি আমার বই *মাদখালু লি মারিফাতিল ইসলাম*[২১] বা *ইসলাম পরিচিতি প্রথম পাঠ* বইতে। বইতে চারটি মৌলিক বিষয় রয়েছে। তা হলো—

১. ইসলামের মৌলিক উপাদানসমূহ
২. ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ
৩. ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ
৪. ইসলামের মৌলিক উৎসসমূহ

আর ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ হলো—

ক. উপযুক্ত মানুষ গড়া

খ. উপযুক্ত পরিবার গড়া

গ. উপযুক্ত সমাজ গড়া

ঘ. উপযুক্ত জাতি গড়া

ঙ. মানবকল্যাণের দিকে আহ্বান।[২২]

এগুলো অন্য পাঁচটি মৌলিক বিষয়, ইসলাম কুরআন ও তার নবির সুন্নাহতে মানবজীবনে যা বাস্তবায়নের ইচ্ছে করেছে এবং তার বিধানসমূহ একে ঘিরেই।

পাঁচটি মৌলিক বিষয়ে মাকাসিদকে সীমাবদ্ধ করা

মাকাসিদসংক্রান্ত বিষয়ে উসুলবিদদের উল্লিখিত বিষয়ে আমার কাছে কিছু প্রশ্ন আসে। যেমন : মাকাসিদ কি পুরোপুরি এই পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ? নাকি এই পাঁচটির বাইরেও কোনো মাকাসিদ রয়েছে?

ইমাম কারাফিসহ প্রাচীন কিছু আলিম 'সম্মান' সংরক্ষণকে মাকাসিদুশ শরিয়ার মাঝে উল্লেখ করেছেন। আমি এই মত সমর্থন করি। কারণ, হাদিসে বারবার তার কথা এসেছে। যেমন : প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের রক্ত, সম্মান, সম্পদ হারাম।[২৩]

অন্য হাদিসে নবি (সা.) বলেছেন—'তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্মান, তোমাদের সম্পদ তোমাদের ওপর হারাম...'[২৪]

---

[২১] বইটি মাকতাবাতু ওহাবা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

[২২] প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ : আহদাফুল ইসলাম, পৃষ্ঠা : ১৯১-২৮৮

[২৩] সহিহ মুসলিম : ২৫৬৪

[২৪] সহিহ মুসলিম : ১২১৮

আর সম্মানহানির স্পষ্ট সাজা রয়েছে কুরআনে। তা হলো—(قذف) কজফের[২৫] শাস্তি। আর এটা প্রতীয়মান যে, শরয়ি শাস্তির সাথে মাকাসিদের একটি সংযোগ রয়েছে। অথবা মাকাসিদ সংজ্ঞায়নের শরয়ি শাস্তির একটি প্রভাব রয়েছে।

ইসলাম ত্যাগের শাস্তি : তা থেকে নেওয়া হয়েছে দ্বীনের গুরুত্ব ও জরুরিয়াত।

কিসাসের শাস্তি : তা থেকে নেওয়া হয়েছে জীবনের গুরুত্ব ও জরুরিয়াত।

যিনার শাস্তি : তা থেকে নেওয়া হয়েছে বংশের গুরুত্ব ও জরুরিয়াত।

চুরির শাস্তি : তা থেকে নেওয়া হয়েছে সম্পদের গুরুত্ব ও জরুরিয়াত।

মাদক সেবনের শাস্তি : তা থেকে নেওয়া হয়েছে আকলের গুরুত্ব ও জরুরিয়াত।

সুতরাং কজফের শাস্তি থেকে এমন গুরুত্ব বের করে নিলে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ, সম্মানের মানে হলো—মানুষের সুনাম ও মর্যাদা। আর এটা মৌলিক মানবাধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বর্তমান সময়ে যার একটি বড়ো গুরুত্ব রয়েছে। আল্লামা তাহের ইবনে আশুর সম্মানকে উল্লিখিত জরুরিয়াতের মাঝে জায়গা দিতে সম্মত হননি। তিনি মনে করেন, এটা গুরুত্ব এ পর্যায়ে পৌঁছেনি। আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন। তিনি জরুরিয়াতকে বস্তুগত বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, যা ছাড়া মানুষ জীবনযাপন করতে পারে না।

আরও কিছু জরুরি মাকাসিদ ও মাসালিহ রয়েছে, উল্লিখিত পাঁচটি যা ধারণ করেনি। তন্মধ্যে রয়েছে যা কিছু সামাজিক মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত যেমন : স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্ব, যৌথ দায়ভার ও মৌলিক মানবাধিকার। তার কিছু রয়েছে সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের সাথে জড়িত।

আমার কাছে মনে হয়েছে, প্রাচীন উসুলবিদদের মনোযোগ ছিল মুকাল্লাফ ব্যক্তির দ্বীন, জীবন, বংশ, আকল ও সম্পদের দিকে। তারা সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র ও মানবীয় সম্পর্কের দিকে সমান মনোযোগ দেননি।

তন্মধ্যে রয়েছে চারিত্রিক কিছু বিষয়। তারা এটাকে জরুরিয়াত বা হাজিয়াত হিসেবে দেখেননি; বরং তাহসিনিয়াতের গণ্ডিতে রাখা যথেষ্ট মনে করেছেন। সম্ভবত তারা প্রথম জরুরি বিষয় দ্বীনের মাঝে মৌলিক চারিত্রিক বিষয় তথা সত্যবাদিতা, আমানতদারি, ন্যায়পরায়ণতা, ইহসান, পবিত্রতা, লজ্জাশীলতা, নমনীয়তা, আত্মমর্যাদাবোধ, দয়া, সদাচার, বীরত্ব, দানশীলতা ইত্যাদিকে যুক্ত করে দিয়েছিলেন। সুতরাং প্রত্যেক যে বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহতে আদেশ এসেছে, তা দ্বীন শব্দ তা ধারণ করে।

তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—এখানে উসুলবিদগণ যা উল্লেখ করেছেন, যা সংরক্ষণ করা জরুরি এবং যাকে গুরুত্বের কেন্দ্রে রাখতে হবে, তা হলো— শরিয়াহ মৌলিক বিষয় ও মাসালিহকে তিনটি স্তর ও মর্যাদায় বিভক্ত করা। যার ওপর ভিত্তি করে ইমাম গাজালি তাঁর বয়ানের ভিত নির্মাণ করেছেন। আর পরবর্তী আলিমগণ আজ পর্যন্ত তাঁকেই অনুসরণ করেছেন। আর তা হলো—

১. জরুরিয়াতের পর্যায় বা জরুরি ক্ষেত্রে

---

[২৫] কজফ শব্দের আভিধানিক অর্থ নিক্ষেপ করা। পরিভাষায় কোনো সতী-সাধ্বী রমণী কিংবা পবিত্র পুরুষকে যিনার অপবাদ দেওয়া। অবশ্য মদপান, চুরি ইত্যাদি অন্যায় কাজের অপবাদ দেওয়াও একধরনের কজফ।

২. হাজিয়াতের পর্যায় বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে

৩. তাহসিনাতের পর্যায় বা সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে

এই প্রকারভেদ যৌক্তিক। মুজতাহিদগণ বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনা ও প্রেক্ষাপটে হুকুম পেতে এ প্রকারভেদের দারস্থ হন। জরুরিয়াত হাজিয়াতের ও তাহসিনিয়াতের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। আর হাজিয়াত তাহসিনিয়াতের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। আর এসবগুলোর হুকুম তার স্তর বা মর্যাদা অনুযায়ী। তবে জরুরিয়াতের সবগুলোই সমমর্যাদার নয়; বরং একেকটির মর্যাদা অন্যটির চেয়ে ভিন্ন। প্রথমটি হচ্ছে দ্বীন, তারপর জীবন।

এখানে কিছু পর্যবেক্ষণ রয়েছে, উসুলবিদগণের জরুরিয়াত ও মৌলিক বিষয়ের দ্বারা দলিল পেশ করার ব্যাপারে। যেমন : তারা মাদক হারাম হওয়া এবং তা সেবনকারীর ওপর শাস্তি প্রয়োগের ব্যাপারে দলিল পেশ করেছেন আকলের সংরক্ষণ দ্বারা।

আমি মনে করি, ইসলামে আকলের সংরক্ষণ বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন : মুসলিম নারী ও পুরুষের ওপর জ্ঞানার্জন ফরজ হওয়া, জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে সফর, দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন, দ্বীন ও দুনিয়ার কাজে উম্মাহর জন্য প্রয়োজনীয় সকল ইলম ফরজে কেফায়া হওয়া, জ্ঞানগত, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সুচিন্তিত তত্ত্ব উদ্ভাবন, সন্দেহযুক্ত বিষয় ও প্রবৃত্তির অনুসরণ পরিহার। একইভাবে পূর্বপুরুষ, বড়ো নেতা, আমজনতা ও চরিত্রহীন ব্যক্তির অন্ধ অনুকরণও পরিহারযোগ্য। আকল সংরক্ষণের আরও উপায় হচ্ছে আসমান, জমিন ও আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি চিন্তা ও গবেষণার দৃষ্টি দেওয়া। বিষয়টি আমি আমার বই *কুরআনুল কারিমে আকল ও ইলম*-এ উল্লেখ করেছি।

অন্যান্য মৌলিক বিষয়েও আমরা একই রকম পর্যবেক্ষণ পাব। আর জ্ঞানের দরজা সর্বদা উন্মুক্ত, যা কখনো থেমে যায় না।

وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيم-

'আর প্রত্যেক জ্ঞানীর ওপর রয়েছেন একজন মহাজ্ঞানী।'[২৬]

আর আমাদের শেষ কথা—আল্লাহ সকল প্রশংসা ও শুকরিয়ার মালিক, তিনি সকল জাহানের রব।

[২৬] সূরা ইউসুফ : ৭৬

শরিয়ার উদ্দেশ্য এবং নসের সমন্বয়

সকল প্রশংসা মহাবিশ্বের রব আল্লাহ তায়ালার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর জন্য, যাকে বিশ্বজগতের প্রতি রহমত ও মুমিনদের জন্য নিয়ামত হিসেবে আল্লাহ তায়ালা পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁদের আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শুনিয়েছেন, তাঁদের পরিশুদ্ধ করেছেন, তাঁদের কিতাব ও হিকমত শিখিয়েছেন। যদিও তারা ইতঃপূর্বে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল। আল্লাহ তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবি এবং ইহসানের সাথে যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের অনুসরণ করবে, তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

কুরআনের একটি বরকতপূর্ণ নির্দেশনা হলো—মানবীয় শক্তি ও ক্ষমতা বিভিন্ন ক্ষেত্র, ময়দান ও অঙ্গনে ভাগ করে রাখা। এতে সকল শক্তি একটি নির্দিষ্ট দিকে কেন্দ্রীভূত হয় এবং অন্য ক্ষেত্রগুলো প্রয়োজনীয় শক্তির অভাবে ভুগতে থাকে। যেমন : বিভিন্ন হাদিসে উম্মাহর জন্য বিপজ্জনক একটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে—'যখন তার সদস্যরা কৃষিকাজে তুষ্ট হবে, গরুর লেজের অনুসরণ করবে এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ত্যাগ করবে।'[২৭]

কুরআনুল কারিম সূরা তাওবায় এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছে—

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ-

'আর মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদের সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে।'[২৮]

কুরআনুল কারিম মুমিন সমাজের সকল সদস্যের জিহাদে বের হওয়াকে ভুল বলে বর্ণনা করেছে; যদিও আল্লাহর দ্বীনে জিহাদের অবস্থান খুবই উঁচুতে। তা ছাড়া নবুয়তের যুগে মুসলমানরা চতুর্দিক থেকে হুমকিতে ছিল এবং দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনার অতল গহ্বরে অবস্থান করছিল।

---

[২৭] এখানে একটি হাদিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন—'তোমরা যখন ইনা পদ্ধতিতে ব্যাবসা করবে, (প্রকৃত মূল্যের চেয়ে ধারে অধিক ক্রয়-বিক্রয় করা। যেমন : কেউ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ১০ টাকায় কিছু বিক্রি করল এবং সে সময় শেষ হওয়ার পর তা আট টাকায় কিনে নিল।) গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ করা ছেড়ে দেবে, তখন আল্লাহ তোমাদের ওপর লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দেবেন। তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের এই অপমান থেকে মুক্তি দেবেন না।' দ্র. মুসনাদে আহমাদ : ৪৮২৫; সুনানে আবু দাউদ : ৩৪৬২
তাখরিজকারীগণ এ হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন। *তাহজিবু সুনানি আবি দাউদ* গ্রন্থে ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) হাদিসটিকে শক্তিশালী বলেছেন। শাইখ আলবানি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। *সহিহুল জামিউ* : ৪২৩

[২৮] সূরা তাওবা : ১২২

এতৎসত্ত্বেও কুরআন তাদের উদ্দেশে বলেছে, তারা যেন তাদের সকল শক্তি একমাত্র জিহাদের ময়দানে ব্যয় না করে। মানবজাতির জন্য বিশ্বজনীন এক বার্তার বাহক এ উম্মাহর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। সেগুলো থেকে উম্মাহকে গাফিল হওয়া চলবে না। সে দায়িত্বের একটি হলো, দ্বীনের গভীর উপলব্ধি। উম্মাহর জন্য ফরজে কেফায়া হলো—তার মধ্য থেকে একটি দল বা জামাত বের হবে, যারা দ্বীনের গভীর উপলব্ধি অর্জন এবং তার গূঢ় রহস্যে প্রবেশ করবে। অতঃপর তার জাতির কাছে ফিরে যাবে দাঈ ও শিক্ষক হিসেবে।

এখানে কুরআনের বর্ণনার অনুপম দিক হলো—কুরআন 'নফর' শব্দ ব্যবহার করেছে, যা সাধারণত জিহাদসংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবহৃত হয়। এ থেকে বোঝা যায়, জ্ঞানার্জন ও দ্বীনের গভীর উপলব্ধি এক প্রকার জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। হাদিসে এসেছে—'যে জ্ঞানার্জনের জন্য বের হলো, সে আল্লাহর রাস্তায়; যতক্ষণ না ফিরে আসে।'[২৯]

আরেকটি সহিহ হাদিসে এসেছে, রাসূল (সা.) বলেন—'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর উপলব্ধি দান করেন।'[৩০]

দ্বীনের গভীর উপলব্ধি দ্বীনি জ্ঞানার্জনের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দ্বীনি জ্ঞান বলতে বাহ্যিকভাবে ধর্মীয় জ্ঞান অনুধাবনকে বোঝায়। আর দ্বীনের গভীর জ্ঞানের উপলব্ধি দ্বারা ধর্মীয় জ্ঞানের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় বিষয় অনুধাবন করাকে বোঝায়। আর এই ধর্মীয় জ্ঞানের গভীর উপলব্ধি সর্বপ্রথম যে জিনিসটি অন্তর্ভুক্ত করে তা হলো—ইলমুল মাকাসিদ, যার উদ্দেশ্যেই দ্বীনের আগমন। এ কারণে মাকাসিদুশ শরিয়াহ বা দ্বীনের গূঢ় তত্ত্বের জ্ঞানকে দ্বীনের উপলব্ধির শাঁস বা মজ্জা বলে বিবেচনা করা হয়।

আর অনেকেই নুসুসের বাহ্যিক অর্থের সাথে লেগে থাকে। তারা দ্বীনের হাকিকত ও গভীরতা খুঁজতে ডুব দিয়ে তার উদ্দেশ্য ও রহস্য বুঝতে পারে না। তাদের জ্ঞানকে আমি দ্বীনের উপলব্ধি (ফিকহ) বা দ্বীনের হাকিকত জানা মনে করি না। আর অন্যদিকে দ্বীনের রহস্য এবং শরিয়ার মাকাসিদের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার মানে এটা নয়, আমরা কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট নস থেকে বিমুখ হব। আর বলব, আমরা শুধু মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহের অনুসরণই যথেষ্ট মনে করি এবং কোনো বিষয়ের বিশেষ নস নিয়ে লেগে থাকি না। এটা চরম নিন্দনীয় বক্রতা এবং পবিত্র নসকে তুচ্ছজ্ঞান করার শামিল। এমন কিছু মুমিনের দ্বারা সংঘটিত হতে পারে না।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا-

'আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু ইখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল, সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে!'[৩১]

---

[২৯] জামে আত-তিরমিজি : ২৬৪৯

[৩০] *আল লুলু ওয়াল মারজান* : ৬১৫; সহিহ বুখারি : ৭১

[৩১] সূরা আহজাব : ৩৬

মূলত এ ব্যাপক বিস্তৃত বিষয় ‘নুসুস ও মাকাসিদের সম্পর্ক’ নিয়েই আমাদের এই গবেষণা। আমরা এখানে এ বিষয়ের তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করব। দুটি প্রান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দুটির মাঝে মধ্যমপন্থি দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের পক্ষ-বিপক্ষের কথা।

আল্লাহ আমাদের সুপথ পদর্শন করুন। তিনিই একমাত্র পথ দেখান।

মৌলিক মাকাসিদ এবং প্রাসঙ্গিক নুসুস

আমাদের কাঙ্ক্ষিত শরিয়ার এই ফিকহ যে নীতির ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা তা হলো—আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আসা কুরআন-সুন্নাহর উক্তি তথা নসকে শরিয়ার মৌলিক উদ্দেশ্যের আলোকে বুঝে থাকি। অর্থাৎ, ছোটো ছোটো বিষয়গুলো শরিয়ার মৌলিক উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে। আর সকল আহকাম তার আসল মাকাসিদ তথা উদ্দেশ্যের সাথে সংযুক্ত থাকবে, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।

মাকাসিদসংক্রান্ত তিনটি চিন্তাধারা

ইতঃপূর্বে আমি মাকাসিদুশ শরিয়াহসংক্রান্ত আমার একটি গবেষণায়[৩২] উল্লেখ করেছি—এ বিষয়ে তিনটি চিন্তাধারা রয়েছে। প্রত্যেকটিরই রয়েছে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও মানহাজ।

এক : প্রথম চিন্তাধারা হলো তারা, যারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নুসুসের ওপর গুরুত্ব দেয়। নুসুসের সাথে লেগে থাকে। নুসুসের পেছনে থাকা শরিয়ার উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়ে তাকে প্রান্তিকভাবে বোঝে। তাদের আমি অক্ষরবাদী বলে অভিহিত করি। আর এই অক্ষরবাদীদের আমি অতীতে 'নব্য জাহেরি' চিন্তাধারা নামে নামকরণ করেছি। তারা প্রাচীন জাহেরিদের উত্তরসূরি, যারা আহকামের ব্যাখ্যা এবং আহকামের পেছনে হিকমত ও মাকসাদ তথা উদ্দেশ্যকে সংযুক্ত করা প্রত্যাখ্যান করেছেন। শুধু তা-ই নয়, কিয়াসকেও অস্বীকার করেছেন। তারা বলেছেন—আল্লাহ তায়ালার জন্য এটা সম্ভব ছিল যে, তিনি আমাদের যে বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন, সে বিষয়ে নিষেধ করার। আর যে বিষয়ে নিষেধ করেছেন, সে বিষয়ে আদেশ করার; এমনকি তিনি চাইলে আমাদের শিরকের আদেশ ও তাওহিদ থেকে নিষেধ করতে পারতেন।

এই চিন্তাধারার অনুসারীরা প্রাচীন জাহেরিদের কাছ থেকে প্রান্তিকতা ও কঠোরতা লাভ করেছেন; কিন্তু জ্ঞানের প্রশস্ততা এবং হাদিস ও আসারে সমৃদ্ধি লাভ করতে পারেননি।

এই চিন্তাধারার কিছু বৈশিষ্ট্য ও নীতি রয়েছে। এর আলোকে তারা পরিচালিত হয়। আর ফিকহ এবং জীবন ও মানুষের ব্যাপারে তাদের অবস্থানের কারণে কিছু ফলাফল ও প্রভাব রয়েছে।

দুই : দ্বিতীয় চিন্তাধারার নাম দিয়েছি নব্য মুয়াত্তিলা। এরা হলো জাহেরিদের ঠিক বিপরীত চিন্তাধারা। তাদের দাবি—তারা শরিয়ার মাকাসিদ এবং দ্বীনের রুহের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়। আর এটি করতে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আসা কুরআনের আয়াত ও সহিহ সুন্নাহকে তারা একেবারেই অকার্যকর করে দেয়। তারা দাবি করে—দ্বীন হচ্ছে আত্মিক বিষয়, বাহ্যিক আকৃতি নয়; হাকিকত, প্রতিকৃতি নয়। আপনি যদি তাদের সামনে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট অর্থবোধক নুসুস পেশ করেন, তারা ঘোরানো-প্যাঁচানো শুরু করবে। বিশুদ্ধ হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করতে তারা দ্বিধা

---

[৩২] *আস-সিয়াসাতুস শরয়িয়্যা ফি জওয়ি নুসুসিশ শরইয়্যা ওয়া মাকাসিদিহা*, পৃষ্ঠা : ২২৮-২৮৬; *তাইসিরুল ফিকহ* : ১/৯০-৯৮; *মাদখালুন লিদিরাসাতিশ শরইয়্যাতিল ইসলামিয়্যা*, পৃষ্ঠা : ৫৫-৮৬

করে না। বাস্তবতা হলো—তারা সহিহ ও জয়িফ বোঝেই না। তারা নিজেদের মতো কুরআনের তাফসির এবং মনমতো বয়ান তৈরি করে। আর মুতাশাবিহ বিষয় আঁকড়ে ধরে এবং মুহকাম বিষয় থেকে দূরে থাকে। তারা তাজদিদের দাবি করে, কিন্তু এর মাধ্যমে তারা মূলত পশ্চিমের দিকে ডাকে এবং অন্যায় হস্তক্ষেপ করে।

সেক্যুলার, পশ্চিমাপন্থি ও নব্য সংস্কারবাদীদের অনেকে শরিয়াহসংক্রান্ত আলোচনায় নিজেদের নিয়োজিত করে। অথচ মজার ব্যাপার হলো—শরিয়াহ বিষয়ে তাদের কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। তাদের অনেকে তো কুরআনের আয়াত কিংবা একটি হাদিস পর্যন্ত শুদ্ধ করে পড়তে পারে না। এই সমস্ত লোকই নব্য মুয়াত্তিলা চিন্তাধারার অনুসারী।

আশ্চর্যের বিষয় হলো—তারা তাদের ইমাম দাবি করে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে। তাদের দাবি—কুরআন ও সুন্নাহ যখন কল্যাণের বিপরীত হয়েছে, তখন তিনি নুসুসকে এড়িয়ে গেছেন। এ দাবি সর্বতোভাবে ভুল ও বাতিল। আল্লাহ তাঁকে তাদের এমন দাবি থেকে রক্ষা করুন। তিনি কুরআনের আয়াতের সীমায় থেমে যেতেন। যখনই তাঁকে নস স্মরণ করিয়ে দেওয়া হতো, তিনি ফিরে আসতেন সাথে সাথেই। আর এ ভ্রান্ত দাবিটির জ্ঞানগত ও বিস্তারিত জবাব আমি আমার বই *আস-সিয়াসাতুশ শরইয়্যা ফি জওয়ি নুসুসিশ শরইয়্যা ওয়া মাকাসিদিহা* বা *শরিয়ার নুসুস ও মাকাসিদের আলোকে শরিয়াহসম্মত রাজনীতি* বইতে দিয়েছি।[৩৩]

ইসলামি শরিয়াহ ও তার ফিকহে অনুপ্রবেশকারী এই লোকরাই 'নব্য মুয়াত্তিলা'। এ চিন্তাধারার নাম 'নব্য মুয়াত্তিলা চিন্তাধারা'। এই চিন্তাধারারও রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও নীতি। তাদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু আছে, যাকে কেন্দ্র করে তারা বিবর্তিত হয়। আর জীবন, সমাজ ও মানুষের মাঝে রয়েছে তাদের তাত্ত্বিক ও বাস্তবিক ফলাফল ও প্রভাব।

তিন : শেষ চিন্তাধারাটি হলো—মধ্যমপন্থি (ওয়াসাতিয়্যা) চিন্তাধারা। এই চিন্তাধারার অনুসারীরা আল্লাহর কিতাব ও বিশুদ্ধ সুন্নাহর নুসুস উপেক্ষা করে না। তাকে শরিয়ার মৌলিক উদ্দেশ্যর সাথে মিলিয়ে উপলব্ধি করতে চায়। তাকে বোঝে মাকাসিদের আওতায়, মাকাসিদের আলোকে। শাখা-প্রশাখাকে বোঝে মূলের আলোকে। আনুষঙ্গিক বিষয়কে উপলব্ধি করে মৌলিক বিষয়ের সাথে মিলিয়ে। পরিবর্তনশীল বিষয়গুলোকে মূল্যায়ন করে অপরিবর্তনীয় বিষয়াদির মাধ্যমে। মুতাশাবিহ বিষয়কে মুহকাম বিষয়ের দিকে ফিরিয়ে দেয়।

তারা অকাট্য নুসুসকে তার অকাট্যতা ও প্রামাণ্যতা প্রমাণিত হওয়াসাপেক্ষে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে। আর এই আঁকড়ে ধরা হচ্ছে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরা, যার ছুটে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ফলে উম্মাহ একিনভিত্তিক মজবুত ইজমার সাথে পরিচিত হয়। আর তা পরবর্তী সময়ের মুমিনদের জন্য উদাহরণ হিসেবে নিজেকে পেশ করে, যা থেকে বিচ্যুত বা ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই।[৩৪] এটা অপরাধীদের পথ[৩৫] সুস্পষ্ট পার্থক্য করে দেয়, যা কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা যা থেকে সতর্ক করেছেন।

---

[৩৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৬৯-২২২

[৩৪] এখানে সূরা নিসার একটি আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۗ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا-

আমরা এ চিন্তাধারায় বিশ্বাস এবং তার মানহাজকে পূর্ণ অনুসরণ করি। আমরা মনে করি, এটাই ইসলামের সঠিক নির্দেশনা এবং তার শত্রুদের দুষ্কর্মের প্রতিহতকারী। এ মানহাজই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.) থেকে প্রাপ্ত সঠিক চিন্তা। আর এই চিন্তাধারাই পরবর্তী যুগের ইনসাফপূর্ণ নবুয়তের ধারক ও রিসালাতের উত্তরাধিকারীদের চিন্তাধারার পরিপূর্ণতা দেয়—যাদের সত্য বয়ান ও বাতিলের প্রতিহতকরণের প্রশংসা হাদিসে এসেছে। রাসূল (সা.) বলেন—

> 'এই ইলম পরবর্তী প্রতিটি যুগের ন্যায়নিষ্ঠ ধারকরা বহন করবে। তারা বাড়াবাড়িকারীদের প্রান্তিক বয়ান, বাতিলপন্থির অনিষ্ট এবং মূর্খের ব্যাখ্যা থেকে একে সুরক্ষিত রাখবে।'[৩৬]

এই চিন্তাধারারও পূর্ববর্তী চিন্তাধারার মতো কিছু বৈশিষ্ট্য, মূলনীতি রয়েছে। রয়েছে তার চিন্তা ও উপলব্ধি, বাস্তব দর্শন এবং সমুজ্জ্বল শরিয়ার আলোকে যুগের সমস্যা সমাধানে তার ফলাফল ও প্রভাব।

আমরা এখন বিস্তারিতভাবে আলাদা অধ্যায়ে তিনটি চিন্তাধারার তার উপলব্ধি ও অবস্থানসহ বর্ণনা করব।

'যে ব্যক্তি সত্যপথ প্রকাশিত হওয়ার পরও রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সে পথেই ফেরাব, যে পথে সে ফিরে যায়। আর তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব। কতই-না মন্দই সে আবাস!' সূরা নিসা : ১১৫

উসুলবিদগণ এ আয়াতটিকে ইজমার দলিল হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন।

[৩৫] এখানে সূরা আনআমের একটি আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ-

'এভাবেই আমি আমার আয়াতগুলোকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি, যাতে অপরাধীদের পথ পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পেয়ে যায়।' সূরা আনআম : ৫৫

[৩৬] হাদিসটি ইমাম ইবনে জারির তাবারি, খতিবে বাগদাদি, ইবনে আদি, দারাকুতনি, খাল্লাল, কাজি ইসমাইল প্রমুখ বিভিন্ন সাহাবির সনদে বর্ণনা করেছেন। আর এই হাদিসটিকে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বেশ কয়েকটি পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে শক্তিশালী বলেছেন। ইমাম আহমাদ (রহ.)-ও হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। দ্র. *মিফতাহু দারিস সাআদা* : ১/১৬৩-১৬৪

আল্লামা ইবনে ওয়াজির (রহ.)-ও হাদিসটিকে হাসান ও সহিহ বলেছেন। হাফিজ ইবনে আবদুল বারও তা বিশুদ্ধ বলেছেন। আকিলি বলেছেন—এ হাদিসের বর্ণনাকারীরা ছিলেন আমানতদার। অতএব, হাদিসটি বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ায় তা গ্রহণ ও অনুসরণ করা আবশ্যিক। দ্র. *আর-রওজুল বাসিম ফিজ জিব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম* : ১/২১-২৩